৪র্থ
পর্ব
দ্বীন কায়েম
একটি কৌশলগত পর্যালোচনা
الحكمة
আল হিকমাহ
মিডিয়া
আবু আনওয়ার আল হিন্দি
(হাফিজাহুল্লাহ)

দ্বীন কায়েম

একটি কৌশলগত পর্যালোচনা

৪র্থ পর্ব

আবু আনওয়ার আল হিন্দি (হাফিজাহুল্লাহ)

পরিবেশনায়

আল হিকমাহ মিডিয়া

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে (বিশ্বব্যাপী জিহাদি আন্দোলনের) পরিস্থিতি ছিল বেশ খারাপ। কারণ জিহাদি জামা'আগুলো তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সাধারণ মুসলিম জনসাধারনকে সচেতন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। মুজাহিদিন কি চাচ্ছেন, কেন জিহাদ করছেন, সাধারণ মুসলিমদের বুঝে এগুলো আসতো না। জিহাদী তানজীম এবং জামা'আ ছিল অনেক, কিন্তু তারা ছিলেন পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং সকলে বিভিন্ন জায়গায় ত্বওয়াগীতের মোকাবেলায় ব্যস্ত ছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা জিহাদি জামা'আগুলো একেক অঞ্চলের একেক ত্বওয়াগীতের বিরুদ্ধে ক্বিতালে লিপ্ত ছিল। কখনো তারা জিতছিল, কখনো তারা হারছিল। আর এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ত্বওয়াগীত মুজাহিদিনকে কোন না কোন ভাবে অবরুদ্ধ করতে সক্ষম হচ্ছিল...যখন আমরা এই পরিস্থিতির পর্যালোচনা করি, আমরা দেখি কিভাবে ত্বওয়াগীত পেশির জোরে, অস্ত্রের জোরে উম্মাহর উপর কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছিল এবং নিজেরদের টিকিয়ে রেখেছে। কিভাবে মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রন করার মাধ্যমে, তারা সাধারণ মুসলিম জনগণের চিন্তা ও বিবেকের নিয়ন্ত্রন গ্রহণ করেছিল। মোটকথা, সব জায়গাতেই জিহাদি আন্দোলন ব্যাপক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হচ্ছিলো, এবং অবরুদ্ধ হয়ে পরছিল। আফগানিস্তান ছাড়া আর কোথাও তারা কোন নিরাপদ আশ্রয় পেলেন না। অন্যান্য সব জায়গাতেই তাদের খোঁজা হচ্ছিলো, হত্যা করা হচ্ছিল। আফগানিস্তানে নিরাপদ আশ্রয় পাবার পর, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন জিহাদি জামা'আর মুজাহিদিন উমারাহগণ এ অবস্থা নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা, পর্যবেক্ষন ও বিশ্লেষণ করলেন – কিভাবে এ পরিস্থিতির উদ্ভব হল আর কিভাবেই বা এই সমস্যার সমাধান করা যাবে? কাবুল ও কান্দাহারে বেশ কিছু মিটিং হল। শায়খ উসামা রাহিমাহুল্লাহ দেখলেন যে জিহাদি আন্দোলনের উচিৎ সে শত্রুকে আক্রমণ করা যার কুফর সর্বাধিক প্রকাশ্য (যাহির)। সেই শত্রুকে না যার কুফরের পরিমাণ সর্বাধিক। তাই কোন মুরতাদ ত্বগুতের অপরাধের পরিমান অনেক বেশি হতে পারে, কিন্তু যায়নিস্ট-ইহুদী ও খ্রিষ্টান-ক্রুসেডারদের কুফর সর্বাধিক প্রকাশ্য। একারণে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে উম্মাহর মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই।

- শায়খ আবু বাসির নাসির আল উহায়শী (রাহিমাহুল্লাহ)

কৌশলগত পর্যালোচনার চতুর্থ এই পর্বে, আমরা আলোচনা করবো বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে জিহাদি আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে। মূল আলোচনায় যাবার আগে একটি বিষয়ে পরিষ্কার করা প্রয়োজন। আগের তিনটি পর্বে আমরা যে আলোচনা করেছি তা করা তানজীম আল-ক্বাইদার বিভিন্ন অফিশিয়াল প্রকাশনা ও উমারাহ ও উলেমাগণের বিভিন্ন লেখা ও বক্তব্যের আলোকে। তাই এগুলো তানজীম আল-ক্বাইদার সাধারণ দিক নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত এ কথা বলা

যায়। আমরা নিজে থেকে কোন কিছু শায়খদের উপর, কিংবা তানজীম আল-ক্বাইদার উপর আরোপ করি নি। কিন্তু এ পর্বে যে আলোচনা হবে, মানহাজের একজন ছাত্র হিসেবে আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষন ও বিশ্লেষণমাত্র

– কোন তানজীম বা জামা'আর অফিশিয়াল বক্তব্য না। একারণে এ পর্বের কথাগুলোকে আমার ব্যক্তিগত অভিমত হিসেবেই ভাইরা গ্রহণ করবেন এবং একে কোনো তানজীমের উপর আরোপ করবেন না। একথাটি এখানে বলা প্রয়োজন, কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইচ্ছায় এ ভূমিতে তানজীম আল-ক্বাইদার কাজ শুরু হয়েছে। AQIS এর মুজাহিদিন এখানে কাজ করছেন, আল্লাহ্‌ তাদের হেফাযত করুন এবং সাফল্য দান করুন– নিশ্চয় সাফল্য একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে। যেহেতু এ মুহূর্তে তানজীম আল-ক্বাইদার কাজ চলছে, আর যেহেতু আমি উসামার মানহাজের আলোকে এই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছি, তাই ভুলবশত কেউ মনে করতে পারেন যে এটাই হয়তো তানজীমের বক্তব্য। কিন্তু তানজীমের অফিশিয়াল বক্তব্য ছাড়া আর কোন বক্তব্যকে তানজীমের বক্তব্য হিসেবে গ্রহণ না করার ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হতে হবে। আর আমাদের ভাইদের অফিশিয়াল বক্তব্য আল্লাহর ইচ্ছায়, তানজীম আল ক্বাইদার মিডিয়া ফ্রন্ট GIMF (Global Islamic Media Front) থেকে GBT [GIMF Bangla Team] –এর মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। সুতরাং অন্যান্য আর কোন বক্তব্য, বিশ্লেষণ, বিবৃতিকে অফিশিয়াল বিশ্লেষণ হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। এখানে যা লেখা হচ্ছে, তা উসামার মানহাজের একজন নগন্য ছাত্র হিসেবে আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষন ও বিশ্লেষণ, যা তানজীমের অবস্থানের সাথে মিলতে পারে, নাও মিলতে পারে। এবং আমার বক্তব্যের চাইতে তাদের বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা লক্ষ গুণ বেশি।

এবার মূল আলোচনায় যাওয়া যাক।

শায়খ আবু বাসির রাহিমাহুল্লাহর উদ্ধৃতিটির গুরুত্ব ব্যাপক। প্রথমত, শায়খ আবু বাসির রাহিমাহুল্লাহর অবস্থানের কারণে। শায়খ ছিলেন AQAP এর আমীর, এবং তানজীম আল-ক্বাইদার নায়েবে আমীর, বৈশ্বিক কর্মকান্ডের (external operations) ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বশীল। এছাড়া আফগানিস্তানে শায়খ আবু বাসির দীর্ঘদিন শায়খ উসামার ব্যক্তিগত সহকারীর (secretary) দায়িত্ব পালন করেছেন। যে কারণে মুজাহিদিন উমারাহদের মিটিং এর ব্যাপারে তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা থাকাটাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, শায়খের এই উদ্ধৃতি থেকে শায়খ উসামা এবং তানজীম আল-ক্বাইদার মানহাজের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় - জিহাদি আন্দোলনের উচিৎ সে শত্রুকে আক্রমণ করা যার কুফর সর্বাধিক প্রকাশ্য (যাহির)। সে শত্রুকে না যার কুফরের পরিমাণ সর্বাধিক। আমাদের আজকের পর্যালোচনার জন্য এই নীতিটি সঠিক ভাবে অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

কৌশলগত পর্যালোচনাঃ বাংলাদেশঃ

ইতিহাসঃ বাংলাদেশে জিহাদি আন্দোলনের ধারার সূচনা আফগান ফেরত মুজাহিদিনের মাধ্যমে। আপনাদের হয়তো মনে আছে, শায়খ উসামা অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে সর্বব্যাপি যুদ্ধের যে ঘোষণা দিয়েছিলেন সেখানে স্বাক্ষরকারীদের একজন ছিলেন হারকাতুল জিহাদ বাংলাদেশের (হুজি-বি) আমীর শায়খ ফাজলুর রাহমান রাহিমাহুল্লাহ। হুজি-বি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯২ সালে হারকাতুল জিহাদ আল ইসলামি'র প্রতিষ্ঠার পর। বাংলাদেশের ব্যাপারে নব্বইয়ের দশকে এবং ২০০০ এর শুরুর দিকে তানজীম আল-ক্বাইদার পরিকল্পনা ছিল আরাকানে জিহাদের জন্য বাংলাদেশকে একটি বাফার যোন (Buffer zone) হিসেবে ব্যবহার করা। যেমন, আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে পাকিস্তান এবং শামের জন্য টার্কি ব্যবহৃত হয়েছে এবং হচ্ছে। বিশেষ করে আরাকানের জন্য চট্টগ্রাম কৌশলগতভাবে ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে। আরাকানে লোক এবং অস্ত্র পাঠানোর জন্য এটিই সর্বোত্তম রুট। পাশপাশি আরাকানে জিহাদের প্রশিক্ষনের জন্য এই অঞ্চলটির গুরুত্ব খুব বেশি। এছাড়া লস্কর-ই-তাইয়্যেবার কিছু সদস্য বাংলাদেশের অবস্থান করেছেন, ভারত থেকে পাকিস্তানে যাওয়া আসা এবং আনা-নেয়ার জন্য বাফার যোন হিসেবে বাংলাদেশকে ব্যবহারের জন্য।

হারাকাতুল জিহাদ বাংলাদেশের মধ্যে পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন বিভক্তি দেখা দেয়। নব্বইয়ের দশকে হুজি-বির একটি উল্লেখযোগ্য অপারেশান ছিল ১৯৯৯ সালে মুরতাদ শামসুর রাহমানকে হত্যা প্রচেষ্টা। বিভক্তির একটি কারণ ছিল, বাংলাদেশে কি ধরণের হামলা করা হবে বা আদৌ করা হবে কি না-এই নিয়ে মতভেদ। এছাড়া বিভক্তির আরো কিছু কারণ ছিল যেগুলো আলোচনা করাটাও কষ্টকর। এই সময়ে ১৯৯৮ সালে শায়খ আবদুর রাহমান রাহিমাহুল্লাহ জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ – জেএমবি – গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। জেএমবি উত্তরাঞ্চলে কর্মকান্ড শুরু করে। তারা মূলত মুরতাদ-নাস্তিক সর্বহারা, বিদেশি এনজিও, খ্রিষ্টান মিশনারী এবং মাজারপূজারি-পীরদের বিরুদ্ধে কর্মকান্ড শুরু করে। আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা জেএমবির উত্থান ২০০৫ এর সিরিয বোমা হামলার মাধ্যমে। কিন্তু এটি একটি ভুল ধারণা। সিরিয বোমা হামলার আগেই জেএমবি তাদের মূল ঘাঁটি উত্তরাঞ্চলে, বিশেষ করে বাগমারা এবং কাছাকাছি অঞ্চলে, ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এক পর্যায়ে এখানে পরিস্থিতি এমন ছিল যে বাংলা ভাই রাহিমাহুল্লাহ, জনসম্মুখে এক মুরতাদ-নাস্তিককে জবাই করেন এবং জনগণ একে সমর্থন করে। শায়খ আবদুর রাহমান নিয়মিত একসময় আদালত পরিচালনা করতেন এবং লোকজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিবাদ শরিয়াহ অনুযায়ী মিটমাট করে দিতেন। এমনকি এক পর্যায়ে ডিসির

অফিসে বসেও জেএমবির সামরিক শাখার প্রধান আতাউর রহমান সানি রাহিমাহুল্লাহ মিটিং করেছিলেন অন্যান্য সদস্যদের সাথে।

মূলত ২০০০ সাল থেকে এ দুটি তানজীম বাংলাদেশে কার্যকলাপের প্রসার শুরু করে। ২০০০ সালে হুজি-বি হাসিনাকে কোটালিপাড়ায় হত্যার একটি চেষ্টা চালায় (৭৬ কেজি বোমা মাটিতে পুতে রাখা হয়েছিল)। ২০০১ সালে রমনা বটমূলে হুজি-বি বোমা হামলা চালায়। পরবর্তীতে হুজি বি আরও কয়েকবার হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা চালায়, যার মধ্যে ২০০২ সালে সাতক্ষীরার কালাওরার ঘটনা (বন্দুকের মাধ্যমে হত্যাচেষ্টা) এবং ২১ অগাস্ট ২০০৪ এর গ্রেনেড হামলা প্রসিদ্ধ। এ হামলাগুলো পরিচালিত হয়েছিল মূলত শায়খ মুফতি আবদুল হান্নান ফাকাল্লাহু আশরাহর নিয়ন্ত্রিত অংশের দ্বারা। ২০০৫ সালে তিনি গ্রেফতার হন। ২০০৫ সালে হুজি-বিকে নিষিদ্ধ করা হয়। তারপর থেকে হুজি-বির আর কোন কর্মকান্ডের কথা জানা যায় না।

জেএমবি ২০০১ থেকে উত্তরাঞ্চলে নিয়মিত হামলা চালালেও মূলত স্পটলাইটে আসে ২০০৫ সালের ১৭ অগাস্টের সিরিয় বোমা হামলার মাধ্যমে। একটি সমন্বিত পরিকল্পনার দ্বারা পুরো দেশের ৬৩টি জেলায় ৫০০টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এ বোমা হামলার উদ্দেশ্য কাউকে হত্যা করা ছিল না, বরং উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় পর্যায়ে জেএমবির কর্মকান্ড শুরুর ঘোষণা দেয়া। কোন বোমাতেই শ্র্যাপনেল ব্যবহৃত হয় নি। এবং এদিন পুরো দেশে জেএমবির আহবান সম্বলিত লিফলেট ছড়িয়ে দেয়া হয়। জেএমবি সরকার, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং জনগণকে ইসলামী শরিয়াহ তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহবান জানায়। এছাড়া জেএমবি ২০০৫ এ আরো কিছু হাই প্রোফাইল আক্রমণ চালায়। অনেকেই জেএমবির একটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় হামলার ব্যাপারে জানেন না আর তা হল মুরতাদ হুমায়ান আজাদের উপর ২০০৪ সালে আক্রমণ।

২০০৬ সালে শায়খ আবদুর রাহমান, আতাউর রহমান সানি এবং বাংলা ভাইসহ ছয়জন শূরা সদস্যকে র‍্যাব গ্রেফতার করে, ২০০৭ সালে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় – রাহিমাহুল্লাহু ‘আল আজমাইন। পরবর্তীতে জেএমবি কাজ চালিয়ে যায়। কিন্তু তাদের সক্ষমতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। ২০০৬ সালে মাওলানা সাইদুর রহমান আমীর নিযুক্ত হন। তিনি ধরা পরেন ২০১০ এ। ২০০৫ থেকে ২০১০ এর মধ্যে তাদের উচ্চপর্যায়ের সদস্যদের বেশিরভাগই ধরা পড়ে যান। মূল শূরা সদস্যরা এবং আমির বন্দী থাকায় সংগঠনের মধ্যে একটি বিভক্তি দেখা দেয়। বন্দী ব্যক্তি কিভাবে আমীর থাকেন? – এর ভিত্তিতে সংগঠন দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায় – যা ভেতরের গ্রুপ, বাইরের গ্রুপ নামে প্রসিদ্ধ। থেমে থেমে তারপরও তারা কিছু কিছু কাজ চালিয়ে যায়, কিন্তু আগের সে ক্ষমতার কাছাকাছি আসতে আর জেএমবি সক্ষম হয়নি। জেএমবি সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে

চমকপ্রদ আক্রমণ চালায় ২০১৪ সালের ত্রিশালে, যখন তারা প্রিজন ভ্যান থেকে সংগঠনের দুই জন শূরা সদস্য সহ মোট তিনজন সদ্যস্যকে মুক্ত করে নিতে সক্ষম হয়।

জামাতুল বাগদাদির খিলাফাহ ঘোষণার পর জেএমবির একটি অংশ তদেরকে বাই'য়াহ দেয় এবং তারাই মূলত বিদেশি, এনজিও, মিশনারী, হোসেনী দালান, এবং আহমেদিয়্যাদের উপর হামলা পরিচালনা করে। তবে জেএমবির পুরো তানজীম সম্ভবত এখনো বাগদাদীকে বাই'য়াহ দেয় নি। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের পাশপাশি, সীমান্তের ওপারে পশ্চিমবঙ্গেও তাদের উপস্থিতি আছে, যা ২০১৪ সালের বর্ধমান বিস্ফোরনের ফলশ্রুতিতে জানা যায়।

হুজি-বি ও জেএমবির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাঃ

সংক্ষেপে এই হল, বাংলাদেশের দুটি জিহাদি তানজীমের পরিচয় এবং কর্মকান্ডের বিবরণ। এদের মধ্য হারকাতুল জিহাদ হল কওমি তথা দেওবন্দী ধাঁচের এবং জেএমবি হল আহলে হাদিস বা সালাফি। হারকাতুল জিহাদের একটি অংশ এক পর্যায়ে গণতান্ত্রিক পন্থায় যোগ দেয়, যা তাদের ইরজা'র পরিচায়ক। অন্যদিকে জেএমবির একটি অংশের মধ্যে তাকফিরের ব্যাপারে গুলুহ (চরমপন্থা) বিদ্যমান। বিশেষ করে যে অংশটি বাইরের অংশ বলে পরিচিত, তাদের মধ্যে। আর এর কারণ হল এই অংশের মধ্যে উলেমার অনুপস্থিতি। অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও এই দুই তানজীমের মধ্যে কিছু সাদৃশ্যও বিদ্যমান – আর তা হল কৌশলগত।

দুটি তানজীমই ঐ ভুলটি করেছে যা শায়খ আবু বাসিরের উদ্ধৃতিতে উঠে এসেছে, "কারণ জিহাদি জামা'আ গুলো তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সাধারণ মুসলিম জনসাধারনকে সচেতন করতে ব্যর্থ হয়েছিল।" হুজি-বি এবং জেএমবির ব্যাপারে এই কথা শতভাগ প্রযোজ্য। একারণেই রমনা বটমূলে হুজি-বির হামলা এবং আদালতে জেএমবির হামলা সাধারণ মুসলিম জনগণের মধ্যে প্রায় কোন সমর্থন পায়নি বললেই চলে।

একই সাথে দুটি তানজিম একই ভুল করেছে যাকে সামরিক পরিভাষায় বলা হয় "Strategic Overreach" বা "স্বীয় সক্ষমতার বাইরে প্রসার"। এর অর্থ হল, সক্ষমতা তৈরি করার আগেই নিজের কর্মকান্ডের পরিধি এমনভাবে বাড়ানো যা শেষ পর্যন্ত নিজের পতন ডেকে আনে। বিশেষ করে জেএমবির ব্যাপারে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। জাতীয় পর্যায়ে আত্মপ্রকাশের আগে জেএমবি তাদের আঞ্চলিক কাজে ব্যাপক জনসমর্থন পাচ্ছিল এবং পরিস্থিতিও মোটামুটি অনুকূলে ছিল। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে তারা এমন এক সময়ে আত্মপ্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়, যখনও তাদের কাজের যে প্রতিক্রিয়া হবে তার মোকাবেলা করার সক্ষমতা তাদের তৈরি হয় নি। যে কারণে সরকার বেশ

দ্রুত তাদের শীর্ষ নেতাদের আটক করে ফেলতে সক্ষম হয় এবং তাদের নেটওয়ার্ক উন্মোচনে সক্ষম হয়। হুজি-বি ২১শে অগাস্টের হামলার উপর অনেক বেশি রিস্ক নিয়ে ফেলে। কারণ হামলা সফল হলে বিএনপি সরকার হয়তো বা তাদেরকে রক্ষা করলেও করতে পারতো, কিন্তু একথা তারা বুঝতে ব্যর্থ হন যে, হামলা ব্যর্থ হলে যেই আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিক্রিয়া হবে তা মোকাবেলা করার সামর্থ্য বা ইচ্ছা কোনটাই বিএনপি সরকারের ছিল না।

প্রতিটি গেরিলা আন্দোলনের জন্য strategic overreach কবীরা গুনাহর মতো। এটি এমন এক ভুল যা কোন ভাবেই করা যাবে না। ইতিহাসখ্যাত সমরবিদ সান-যু, প্রায় ২৫০০ বছর আগে লেখা তার ইতিহাসবিখ্যাত সামরিক কৌশলের গ্রন্থ 'The art of war" ("যুদ্ধনামী শিল্পের মূলনীতিসমূহ") এ লিখেছেন - বুদ্ধিমান সেনাপতি সবসময় যুদ্ধের সময় ও স্থান নিজে নির্ধারণ করেন। প্রতিপক্ষ যখন চান তখন তিনি যুদ্ধে জড়ান না। বরং তিনি যখন চান তখন তিনি প্রতিপক্ষকে যুদ্ধে টেনে আনেন। শায়খ উসামার ৯/১১ এর হামলার পেছনে এই নীতির বাস্তবায়ন দেখা যায়। যদিও অ্যামেরিকা চাচ্ছিলো না, সরাসরি একটি স্থলযুদ্ধে আফগানিস্তানে জড়িয়ে যেতে, কিন্তু শায়খ উসামা অ্যামেরিকাকে বাধ্য করেন। এবং ভৌগোলিক, সামাজিক, সামরিক, এবং আদর্শিক ভাবে অ্যামেরিকার সাথে একটি দীর্ঘ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া এবং আল্লাহর ইচ্ছায় জেতার জন্য, আফগানিস্তান ছিল সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। অন্যদিকে বাংলাদেশে হুজি-বি এবং জেএমবির আক্রমণের দিকে তাকালে দেখা যায়ঃ

১। জনগনের মধ্যে নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যর্থতা। জেএমবির ক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বা দাওয়াহর জন্য তারা যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন (সিরিয বোমা হামলা) সেটাই মিডিয়ার কারণে তাদের জন্য বুমেরাং হয়ে যায়। রাতারাতি সমস্ত দেশকে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা সহজ হয়। গেরিলা যুদ্ধের যে আলোচনা আমরা এর আগে করেছিলাম, তার আলোকে বলা যায়, তাদের অবস্থা হয়েছিল পানি ছাড়া, ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত।

২। নিজেদের জনসমর্থনের একটি শক্ত বেস না থাকা। পুরো দেশের অধিকাংশ জনগণ শুরু থেকেই জিহাদ সমর্থন করবে এটা দুরাশা এবং এরকম হবেও না। কিন্তু ইসলামপন্থী জনগণের [অর্থাৎ যারা মোটা দাগে শরিয়াহ চায় এবং দ্বীনকে ভালোবাসে, সেক্যুলার রাষ্ট্রকে অপছন্দ/ঘৃনা করে] সমর্থনও এই সময়ে ছিল না। যদি এই সমর্থনের কথা বাদও দেই, এই ইসলামপন্থী জনগণ জানতোই না যে আসলে কি হচ্ছে। যেকারণে জামা'আগুলোকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা অত্যন্ত সহজ হয়েছে। কিন্তু গেরিলা যোদ্ধাকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যতো কঠিন হবে, গেরিলাকে হারানোও ততোই কঠিন হবে।

৩। নিজেদের কোন চোখে পড়ার মত মিডিয়া না থাকা। নিজের কোন মুখপাত্র তাদের ছিল না। মিডিয়া একচেটিয়া ভাবে প্রপাগান্ডা চালিয়ে গেছে। তবে এটা সত্য যে, বর্তমানে ইন্টারনেটের যে প্রচলন আছে, যার কারণে অনলাইন মিডিয়ার প্রসার আছে, তেমনটা তখন ছিল না। কিন্তু তবুও নিজেদের একটি মিডিয়া থাকার দরকার ছিল, বিশেষত জেএমবি যেহেতু তারা জাতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

৪। রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া মোকাবেলার প্রস্তুতি না নিয়েই সরাসরি মোকাবেলার পর্যায়ে ঢুকে যাওয়া – strategic overreach। ইতিপূর্বে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। নিজেদের শীর্ষ নেতাদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়া প্রস্তুতির অভাবের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। যুদ্ধে নেতারা ধরা পড়বেন বা নিহত হবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু একসাথে শীর্ষ পর্যায়ের বেশির ভাগ নেতা ধরা পড়ে যাবেন এটা স্বাভাবিক না। আর সম্মুখ যুদ্ধ বা OPEN FRONT এ আপনি তখনই যাবেন যখন আপনি জানেন যে আপনার বেশ কিছু নেতা ধরা পড়লেও আপনি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবেন। এছাড়া যথাযথ অস্ত্রের মজুদ না রাখা আরেকটি কৌশলগত দুর্বলতা। আর জিহাদি সংগঠন গুলোর জন্য বিস্ফোরকের সকল উপকরনের প্রয়োজনীয় মজুদ রাখা, উচু মানের বিস্ফোরক আনা নেয়ার রুট তৈরি এবং নিরাপদ রাখা, পাশাপাশি একাধিক বোমা বিশেষজ্ঞ তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। যদি সংগঠনে শুধু একজন বোমা বিশেষজ্ঞ থাকে তবে তার এই শিক্ষা কয়েকজন উপযুক্ত ছাত্রের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং একবার ছাত্রদের প্রশিক্ষন শেষ হলে, তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে। এক জায়গায় রাখা যাবে না। যাতে সবাই এক সাথে ধরা না পড়ে। অন্যথায়, পুরো জামা'আর বিস্ফোরক ব্যবহারের সক্ষমতা কমে যাবে। বোমা বিশেষজ্ঞ না থাকার ফলাফল কি হতে পারে, তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ হল হোসেনি দালানের হামলা এবং আহমেদিয়া মসজিদে জামাতুল বাগদাদির ইশতিশাদি হামলা। দ্বিতীয় হামলায় হামলাকারীর পাশে দাড়ানো দুই ব্যক্তিও মারা যায়নি, অথচ হামলাকারী মারা গেছে। হোসেনি দালানে অত্যন্ত ভিড়ের মধ্যেও বোমা ক্ষয়ক্ষতি করতে পারে নি, কারণ অত্যন্ত নিচু মানের বিস্ফোরক ব্যবহৃত হয়েছে। এবং বোমা প্রস্তুতকারক সম্ভবত তার কাজে পারদর্শী না।

৫। সিকিউরিটি বা সাংগঠনিক কাজের গোপনীয়তার নিরাপত্তাগত দুর্বলতা। আমরা এই দুই তানজিমের ক্ষেত্রে এখনো দেখতে পাই, কোন একটি কাজ করার পর পরই এবং অনেক ক্ষেত্রে কাজের আগেই [অর্থাৎ কাজের প্রস্তুতির সময়] তারা ধরা পড়ে যাচ্ছেন। এই দুই তানজীমের পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সিকিউরিটির কি করুণ অবস্থা তা বোঝার জন্য এটাই প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এ দুটি তানজীমের নেটওয়ার্ক এতো

গভীরভাবে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে যে কোন একটি কাজের পর, কাজের সাথে যারা জড়িত তাদের তো বটেই, অন্যান্য আরো কিছু সদস্যকেও তারা গ্রেফতার করতে সক্ষম হচ্ছে।

পর্যালোচনাঃ

মু'মিন কখনো এক গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না। আর জ্ঞানী তারাই যারা শিক্ষা গ্রহণ করে। হুজি-বি এবং জেএমবির ইতিহাস থেকে বেশ কিছু মূল বিষয় উঠে আসে যা আমাদের সকলের গভীর ভাবে উপলব্ধি করা উচিৎ।

১। যদি আমরা আসলেই বাংলাদেশে এমন একটি জিহাদ শুরু করতে চাই যা বাংলাদেশের মানচিত্র পাল্টে দেবে এবং বাস্তবতা আগাগোড়া বদলে দেবে তাহলে আমাদের একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে আগাতে হবে। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে, আসবাব ও রসদ মজুদ করতে হবে। হুটহাট কিছু করা যাবে না। একটি দুটি প্রলয়ঙ্করী হামলা দিয়ে বিশ্বের মনোযোগ হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু সম্পূর্ণ শরিয়াহ কায়েম, ত্বগুতের পতন এবং সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রন অর্জিত হবে না।

২। দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হলে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। জনগণের মধ্যে মুজাহিদিনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা এবং সমর্থন সৃষ্টি করতে হবে। শাইখুল মুজাহিদ আব্দুল্লাহ আযযাম যাকে বলেছেন দাওয়াহ আর মাও সে তুং যাকে বলেছে জনগণের জাগরণের পর্যায়। জনগণকে ছাড়া গেরিলা যোদ্ধা ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো। মনে রাখতে হবে আমাদের শত্রুর বিমান, ট্যাংক, যুদ্ধ জাহাজ আছে। ক্রুসেডার আর হিন্দুত্ববাদী ভারতের সমর্থন তার আছে, আছে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন, আর আছে একটি রাষ্ট্রের কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা। জনগণের সমর্থন ছাড়া আপনি যদি চূড়ান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তবে টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন।

৩। বাংলাদেশের ভৌগোলিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা ও গাঁথুনিকে বুঝতে হবে। শায়খ আবু মুসাব আস-সুরি তাঁর The Global Islamic Resistance Call–এ কোন ভূমির Open front জিহাদের জন্য উপযুক্ততা পরিমাপের জন্য কিছু ফ্যাক্টরের কথা বলেছেন। যার মধ্যে একটি হল ভৌগোলিক অবস্থা। যেহেতু মুজাহিদিন এবং তার শত্রুদের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য নেই তাই তাদের যুদ্ধ হবে একটি অভারসাম্যপূর্ণ যুদ্ধ বা Asymmetric Warfare। এধরণের যুদ্ধের উদ্দেশ্য থাকে শক্তিশালী শত্রুকে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে টেনে এনে, শক্তিক্ষয়ের মাধ্যমে তার পরাজয় ঘটানো। যেমন অ্যামেরিকাকে আফগানিস্তানে টেনে এনে পরাজিত করা হয়েছে।

ব্যাপারটা আপনারা এভাবে চিন্তা করতে পারেন – ধরুন আপনার কাছে একটি মাত্র ব্লেড আছে, আর আপনার একটি হাতিকে মারতে হবে। এক্ষেত্রে আপনি সরাসরি হাতির উপর ব্লেড নিয়ে চড়াও হলে আপনার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি, হাতি তার ওজন আর শক্তি ব্যবহার করে আপনাকে পিষে ফেলবে। কিন্তু আপনি যদি কৌশলে হাতিকে একটি চোরাবালিতে টেনে নিয়ে আসতে পারেন, তাহলে হাতির ওজনই তার জন্য কাল হয়ে দাড়াবে। সে চোরাবালিতে আটকে যাবে।। যতো নড়বে তত আরও গভীরে তলিয়ে যাবে। এ অবস্থায় আপনি আস্তে আস্তে ব্লেড দিয়ে হাতির গায়ে বিভিন্ন জায়গায় ধৈর্যের সাথে ৫ হাজার ক্ষত সৃষ্টি করুণ। প্রতিটি নতুন ক্ষতের সাথে সাথে রক্তক্ষরণে হাতি দুর্বল হতে থাকবে। আর প্রতিবার নড়াচাড়ার ফলে তার রক্তক্ষরণ বৃদ্ধি পাবে। এক পর্যায়ে হাতি রক্তক্ষরণের কারণে মারা যাবে।

অ্যামেরিকা হল এই গল্পের হাতি, আফগানিস্তান হল চোরাবালি আর ৯/১১ এর হামলা হল সেই কৌশল যা অ্যামেরিকাকে আফগানিস্তানে টেনে এনেছে। আর মুজাহিদিনের অল্পস্বল্প অস্ত্র এবং বিস্ফোরক হল ব্লেড যা নিয়ে তারা অ্যামেরিকার ব্যাপক সমর শক্তির মুখোমুখি হয়েছে। আর এ ধরণের যুদ্ধই হল Asymmetric warfare, যা হল গেরিলা যুদ্ধ। পুরো ব্যাপারটাতে চোরাবালির গুরুত্ব দেখুন। চোরাবালি ছাড়া কিন্তু পুরো পরিকল্পনাই বাতিল। শায়খ আবু মুসাব আস-সুরি তার কিতাবে ব্যাপক বিশ্লেষণের পর দেখিয়েছেন দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত ভূমি হল যেখানে পর্বত ও জঙ্গল আছে। কারণ পাহাড় ও জঙ্গল গেরিলাদের আশ্রয়স্থল হিসেবে উত্তম, কেননা এগুলো বিমান হামলা থেকে সুরক্ষা দেয়। এছাড়া মরুভূমির উপস্থিতি এবং দুর্গম ভূখণ্ড গেরিলা যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু বাংলাদেশ ভৌগোলিক ভাবে প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে সমতল। যে কারনে যেই নীতি আফগানিস্তানের ভৌগলিক বাস্তবতার জন্য প্রযোজ্য, তা বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য না। সোমালিয়া, ইয়েমেন, ইসলামি মাগরিব, লিবিয়া কাশ্মীর, ওয়াযিরিস্তান, কাভকায- সবগুলো জায়গাতেই পাহাড় বা জঙ্গল কিংবা মরুভূমি আছে এবং এসব জায়গা বেশ দুর্গম যে কারনে এসব ভূখণ্ডে মুজাহিদিন গেরিলাযুদ্ধের পদ্ধতিতে সফল হয়েছেন।

তাহলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কি করা যেতে পারে? এজন্য আমরা অন্য দুটি ভূখণ্ডের দিকে তাকাতে পারি যেখানে দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধ সফল হয়েছে। আর এ দুটি ভূখন্ড হল ইরাক এবং শাম। হ্যা, একথা সত্য যে শাম বা ইরাক কোনটাই বাংলাদেশের মতো সমতল না। শামে পাহাড় এবং মরুভূমি দুটোই আছে, আর ইরাকেও মরুভূমি আছে। কিন্তু লক্ষ্যনীয় বিষয় হল শাম এবং ইরাকে জিহাদ এসব দুর্গম অঞ্চলে শুরু হয় নি। বরং এ দুক্ষেত্রেই শহর কেন্দ্রিক গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে জিহাদের প্রসার ঘটেছে। বিশেষ করে শামে। আর এখানেই সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা অনুধাবনের প্রশ্ন আসে। ইরাকে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল অ্যামেরিকার আগ্রাসনের মাধ্যমে এবং

সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নিদের উপর অ্যামেরিকা সমর্থিত শি'আ শাসন চাপিয়ে দেয়ার কারণে। একই সাথে ইরাকি সমাজ গোত্র নির্ভর, যেকারণে গোত্রীয় নিয়মকানুনের প্রভাব ইরাকি সমাজে ছিল, একই সাথে গোত্রগুলোর কাছে কিছু অস্ত্র মজুদ ছিল, যেগুলো সবসময় তাদের কাছে থাকে।

অন্যদিকে শামে বিপ্লব এবং জিহাদ শুরু হয় শহরগুলোতে। দামাস্কাস, দারা, আলেপ্পো, ইদলিব, হোমস, হামা এসব শহর ছিল বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র। এখনো যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো, জাইশ আল ফাতেহর নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল হল ইদলিব, আলেপ্পোর কিছু অংশ, ইত্যাদি। শহরের মানুষগুলো প্রায় ৫ বছরের এই ভয়াবহ যুদ্ধের পরও, প্রচন্ড অনাহার, ব্যাপক মৃত্যু এবং অবর্ণনীয় কষ্টের পরও জিহাদ আঁকড়ে আছেন। এর কারণ কি? কারণ হল সামাজিক বাস্তবতা। শামে সংখ্যালঘু নুসাইরি সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নিদের শাসন করতো। যখন বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে, সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দেয় তখন সরকার ব্যাপকভাবে সুন্নিদের হত্যা-ধর্ষন-নির্যাতন শুরু করে। যে কারণে সুন্নিরা বাধ্য হয় অস্ত্র তুলে নিতে।

লক্ষ্যনীয় বিষয় হল বাংলাদেশে ইরাকের মতো শি'আ সুন্নি বিভেদ নেই। এখানে শি'আরা ব্যাপকভাবে সংখ্যালঘু এবং তারা ক্ষমতায় নেই। তাই ইরাকে যে শি'আ বিরোধী জনমত ছিল যা শায়খ আবু মুসআব আল যারকাউয়ী ব্যবহার করেছিলেন সুন্নি সমর্থন পাবার জন্য, সেটা বাংলাদেশে অনুপস্থিত। একারনেই হোসেনি দালানের হামলা, কিংবা শি'আদের হোসেনিয়াতে হামলার কোনো কৌশলগত মূল্য নেই। বাংলাদেশের চাইতে পাকিস্তানে শি'আদের প্রকোপ অনেক বেশি। সেখানে শি'আ সুন্নি দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। দীর্ঘদিন ভুট্টোদের শি'আরা পাকিস্তানের ক্ষমতায়ও ছিল। শিআ'দের প্রভাব কমানো এবং নিয়ন্ত্রনের জন্য পাকিস্তানে সিপাহ ই সাহাবা এবং লস্কর ই জাঙ্গভীর মতো বিভিন্ন দলেরও অস্তিস্ত্ব ছিল/আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র শি'আ বিরোধী কৌশল দিয়ে এ দলগুলো বেশি এগোতে সক্ষম হয় নি। সুতরাং পাকিস্তানের মতো জায়গায়, যেখানে শি'আ সুন্নি বিভেদ বিদ্যমান সেখানে যদি শুধুমাত্র শি'আ বিরোধিতার কৌশল জিহাদের জন্য কার্যকর না হয়, তবে বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে শি'আ সুন্নি বিভেদ নেই সেখানে এটা কতটুকু কার্যকর হতে পারে?

আপনি তখনোই সমাজে দাঙ্গা কিংবা সহিংসতা সৃষ্টির জন্য কোন বিভেদকে কাজে লাগাতে পারবেন যখন সেটার অস্তিত্ব থাকবে। কিন্তু যদি এই বিভেদের অস্তিত্বই না থাকে, তাহলে কিভাবে এই অস্তিত্বহীন বিভেদকে কাজে লাগিয়ে জনগনকে জিহাদে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে? ওয়াল্লাহি যারা মনে করে বাংলাদেশে শি'আ বিরোধী, কিংবা আহমেদিয়্যা বিরোধী হামলা দিয়ে জনগনকে জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে, তারা নির্বোধ। একইভাবে রমনা বটমূল, নিউ ইয়ার কিংবা ভ্যালেন্টাইন ডের কোন অনুষ্ঠানে চাঞ্চল্যকরা হামলা করা তুলনামূলকভাবে সহজ, কিন্তু কৌশলগত

ভাবে এগুলোর তেমন কোন তাৎপর্য নেই। কারণ সাধারণ জনগণকে এধরনের হামলাগুলো দূরে সরিয়ে দেবে। একারণে পরিস্থতি সৃষ্টির আগে এমন কোন হামলা করা যাবে না, যা মুজাহিদিনকে এবং জিহাদকে জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।

বরং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটের সাথে সবচেয়ে বেশি যা মেলে তা হল শামের পরিস্থিতি। যদিও শামের মতো নুসাইরিরা বাংলাদেশে নেই। কিন্তু বাংলাদেশে একটি ব্যাপকভাবে অজনপ্রিয় সরকার আছে যারা সরাসরি ভারত দ্বারা সমর্থিত এবং যে সরকারের অধীনে সচিবালয়ে এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে ব্যাপকভাবে মুশরিকদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আর বর্তমানে বিচারবিভাগের প্রধান এক মুশরিক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রশাসনে মুশিরকদের এই ব্যাপক প্রভাব সম্পর্কে জনমনে খারাপ ধারণা ও অসন্তোষ রয়েছে। একই সাথে সরকারের পরিষ্কার ইসলামবিরোধী একটি ইমেজ আছে, যা জনগণের কাছে পরিষ্কার। হাসিনার সরকার যে ইসলামবিরোধী জনমনে এ নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কিভাবে ইসলামের দিকে আসতে হবে, ইসলাম আনতে হবে এ নিয়ে মানুষ এখনো ওয়াকিবহাল না, একই সাথে আছে কওমি ভাইদের উপর হাসিনার ক্রমাগত অত্যাচারের এক ধারা, যা শুরু হয়েছিল ৫ মে এবং যার সিলসিলা আমরা দেখতে পেয়েছি বি.বাড়িয়াতে। পাশপাশি বাড্ডাতে মন্দিরে পবিত্র কুর'আন পোড়ানোর মতো ঘটনা এবং সেই মালাউনকে পুলিশের নিরাপত্তা দেয়া এই সরকারের ইসলামবিরোধী চরিত্রকে আরো পরিষ্কার করে তোলে। এ ধরণের ঘটনাকে যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়, তবে তাকে সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়। তবে আমরা এ ঘটনাটির ক্ষেত্রে তা করতে ব্যর্থ হয়েছি।

মোট কথা বাংলাদেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধের একমাত্র উপযোগি মডেল হল শহর কেন্দ্রিক যুদ্ধ, যেমনটা আমরা শামে দেখছি। আর এরকম একটি দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধে সফলভাবে চালিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজন জনসমর্থন এবং জনসম্পৃক্ততা। আর জনসমর্থন তথা জনসম্পৃক্ততা তৈরির জন্য শি'আ বা আহমেদিয়্যা কিংবা মিশনারি এবং এনজিওদের টার্গেট করা বাংলাদেশের জন্য কার্যকরী হবে না – যদিও এ প্রত্যেকটি কাফির গোষ্ঠীই ইসলামের শত্রু। একটি প্রবল অজনপ্রিয় শাসক যদি সরাসরি মুসলিম জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং যেকোন মূল্যে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার সিদ্ধান্ত নেয় - সেক্ষেত্রে যদি শাসক এবং শাসকের সমর্থক গোষ্ঠীকে যদি মৌলিক ভাবে আলাদা করে ফেলা যায় [অর্থাৎ আওয়ামী লিগ বনাম মুসলিম, আওয়ামী লিগ-সেক্যুলার বনাম মুসলিম, আওয়ামী-হিন্দু-সেক্যুলার বনাম মুসলিম] তবে সেক্ষেত্রে শহর ভিত্তিক গেরিলা যুদ্ধ এমন ভুখন্ডেও সফল হতে পারে যা ভৌগলিক ভাবে গেরিলা যুদ্ধের জন্য অতোটা উপযুক্ত হয়তো না। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে এ যুদ্ধটা কাফির/ত্বগুত/ভারত/আওয়ামী লীগ বনাম ইসলাম এভাবে চিত্রায়িত করতে হবে। হাসিনা-ভারত সেক্যুলার বনাম জিহাদি বা

আল-ক্বাইদা বা সালাফি বা দেওবন্দি এভাবে চিত্রায়িত করলে হবে না। এর উত্তম প্রমাণ হল শাহবাগ বনাম যখন জামাত ছিল অর্থাৎ মিডিয়া যখন এভাবে চিত্রায়িত করছিল, তখন শাহবাগ জিতছিল। কিন্তু যখন ব্যাপারটা শাহবাগ বনাম ইসলামে রূপ নিল, মানুষের মনে এই ধারণা তৈরি হল, তখন মিডিয়ার হাজার প্রপাগান্ডা কোন কাজে আসলো না। অথচ এর আগে পর্যন্ত, অর্থাৎ যখন ব্যাপারটা একটা দলকেন্দ্রিক অর্থাৎ জামাত বনাম শাহবাগ ছিল ততোক্ষণ কিন্তু তারাই জিতছিল। তাই জিহাদিদের কাজ হবে জিহাদের পরিস্থিতি শুরু আগ পর্যন্ত সংঘাতটাকে - আওয়ামী-নাস্তিক-সেক্যুলার-ভারত-ক্রুসেডার জোট বনাম ইসলাম - এভাবে চিত্রায়িত করা। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় একবার জিহাদ শুরু হয়ে গেলে নিয়ন্ত্রন নিয়ে নেয়া। আর এটা স্বাভাবিকভাবেই ঘটবে।

কারণ শায়খ উসামার ভাষায় – জিহাদি আন্দোলনের উচিৎ সে শত্রুকে আক্রমণ করা যার কুফর সর্বাধিক প্রকাশ্য (যাহির)। সে শত্রুকে না যার কুফরের পরিমাণ সর্বাধিক।

আগামী পর্বে ইন শা আল্লাহ বাংলাদেশ-উপমহাদেশের প্রেক্ষাপট এবং জিহাদের সাথে সাধারণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে হিন্দু বিরোধীতার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হবে।